আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করুন
প্রতিষ্ঠা করুন ন্যায়বিচার

মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি স্পেশাল আর্টিকেল ৬

ফেব্রুয়ারী ১৪, ২০১৩

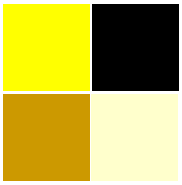

[এই রচনার সকল মন্তব্য এবং যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়]

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করুন
প্রতিষ্ঠা করুন ন্যায়বিচার

অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের রায় প্রদান করেছেন। এই রায় প্রদানের পরপরই তরুণ প্রজন্মের হাজারো সদস্য শাহবাগ চত্বরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ।

তাদের সকলের মত, এই রায় সঠিক নয়।

তাদের দাবি, এই রায় পরিবর্তন করে জামায়াত নেতা কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেয়া হোক।

তারা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত অন্য সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধেও একই রায় দেয়ার দাবি জানিয়েছেন সোচ্চার কণ্ঠে।

তরুণ প্রজন্মের দাবি, তারা সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ফাঁসির রায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবেন না।

যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত সকল ব্যক্তির 'শুধুমাত্র' ফাঁসির রায়ের দাবিতে এই গণজোয়ার আমাদের মনে দুটি আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে।

প্রথম আশঙ্কাটি হল ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পরিবেশকে কেন্দ্র করে।

আমাদের আশঙ্কা এই ধরনের গণজোয়ার থেকে সৃষ্ট একমাত্র ফাঁসির দাবি সংশিষ্ট বিচারকদের মনমানসিকতায় প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে বিচারকরা মনের অজান্তেই কোন ভুল করে ফেলতে পারেন।

আমাদের দ্বিতীয় আশঙ্কাটি গণজোয়ারে উপস্থিত হাজারো তরুণ-তরুণীর আবেগকে কেন্দ্র করে।

শাহবাগে উপস্থিত তরুণ প্রজন্মের সকল সদস্য একটি নির্দিষ্ট রায়ের ব্যাপারেই তাদের অবস্থান তুলে ধরেছেন, তাদের বাধভাঙ্গা আবেগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, বাস্তবে যদি দেখা যায় তাদের প্রত্যাশিত রায় তারা পাননি, তাহলে নতুন প্রজন্মের এই সদস্যরা তো হতাশায় নিমজ্জিত হবেন। দেশের রাজনৈতিক নের্তৃত্ব এবং বিচার বিভাগের প্রতি তাদের এক ধরনের অনাস্থার সৃষ্টি হবে যা দেশের জন্য ভবিষ্যতে শুভ ফল বয়ে আনবে না।

আমাদের আজকের স্পেশাল আর্টিকেল বিপরীতমুখী এই মিশ্র আশঙ্কারই ফসল।

আইনি প্রক্রিয়া

আর্টিকেলটির শুরুতেই আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে পাঠকদেরকে একটু হালকা ধারণা দেয়া যাক।

বিচার বিভাগের আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে যারা ধারণা রাখেন তারা জানেন, একজন বিচারকের দায়িত্ব সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যে কোন মামলার রায় প্রদান করা। কোন ব্যক্তি যদি অন্যায়ের শিকার হন এবং তিনি যদি অভিযোগ তোলেন অমুক ব্যক্তি অন্যায় করেছেন, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিটি যদি অস্বীকার করেন যে তিনি অন্যায় করেননি, তখনই অভিযোগকারী ব্যক্তি আদালতের শরনাপন্ন হন বিষয়টি ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে।

এখানে বিচারকের দায়িত্ব কোন প্রকার আবেগ দ্বারা তাড়িত না হয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মামলাটির ফয়সালা করা। এই ফয়সালার রায় যে কোন পক্ষে যেতে পারে। প্রমাণিত হতে পারে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি সত্যিই দোষ করেছেন। ফলে তার শাস্তি হতে পারে।

আবার এটাও হতে পারে যে অভিযোগকারী ব্যক্তি এমন কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেননি যার মাধ্যমে বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে শাস্তির রায় দিতে পারেন। ফলে পরিশেষে দেখা যেতে পারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়াতে তার কোন শাস্তি হয়নি।

এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগ স্বীকার করে নিতেন, তাহলে অভিযোগকারী ব্যক্তিকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হত না। তারা দুজনে মিলেই বিষয়টির ফয়সালা করে ফেলতে পারতেন। ফলে আদালত নামে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হত না।

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি কারণ সময় সময় প্রকৃত দোষী ব্যক্তিরা যেমন তাদের দোষ স্বীকার করতে চান না, তেমনি অনেক সময় দেখা যায় একজন নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও একজন অসৎ ব্যক্তি সাজানো অভিযোগ তৈরি করেছেন।

তাই এখানে কে দোষী এবং কে নির্দোষ, তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব বর্তায় একমাত্র সংশিষ্ট বিচারকের উপরই।

বিচারকদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ যাতে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত থাকে তার জন্য আইন পেশার উদ্ভব হয়েছে। উদ্ভব হয়েছে আইনি কাঠামোর। আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি প্রদান করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে তার মক্কেলের দাবিই সঠিক। আর আইনজীবীদের এই যুক্তিগুলি সঠিক হয়েছে কিনা, তা দেখে এই বিষয়ে রায় দেয়ার এখতিয়ার একমাত্র বিচারকের।

এখন প্রশ্ন হল, একজন বিচারক যখন রায় দিয়ে দেন, তখন আমরা কি করে বুঝব যে তিনি কোন একটি পক্ষকে ইচ্ছা করে জিতিয়ে দেননি? আমরা কিভাবে বুঝব, তিনি এই রায় প্রদান করতে গিয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকার পরও অন্যায়ভাবে একটি পক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।

বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাইরে সাধারণ মানুষের জন্য এটি বোঝার আসলে তেমন কোন উপায় নেই। তারা এই ব্যাপারে মিডিয়ার বক্তব্য শুনতে পারেন। পত্রিকা পড়তে পারেন। কিন্তু বিচারক আদৌ সঠিক রায় দিয়েছেন কিনা তা বুঝতে পারেন একমাত্র বাদী-বিবাদী পক্ষ এবং আইন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা আদালতে উপস্থিত থেকে রায় সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম।

তাই আইনের শাসনের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে রায় হয়ে যাওয়ার পর বিচারকের দেয়া সেই রায়কে মেনে নেয়া। সাধারণ মানুষের মনে যদি রায় মেনে নেয়ার এই চেতনা জাগ্রত না হয়, তাহলে আদালতের সিদ্ধান্তকে আর কেউ মানবে না। ফলে ধীরে ধীরে দেশ পতিত হবে এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে। পরস্পরের মধ্যে বিরোধের ফয়সালা করতে গিয়ে মানুষ তখন আইন নিজের হাতে নেয়া শুরু করবে। ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের মধ্যে যেমন রায় মেনে নেয়ার চেতনা জাগ্রত করা প্রয়োজন, তেমনি বিচারকদেরও উচিত সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকার পরও এমন কোন বিপরীত রায় প্রদান না করা যার কারণে ভবিষ্যতে বিচারিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

বিচারকরা যাতে ভুল রায় না দেন, তাদের সঠিক রায় দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের যাতে সৃষ্টি হয়, তার জন্য সকল মহলেরই সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকারের যেমন উচিত এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে বিচারকরা নির্ভয়ে একটি নিরপেক্ষ রায় দিতে পারেন, তেমনি সচেতন মানুষদেরও উচিত এমন কোন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা যার কারণে প্রভাবিত হতে পারেন বিচারকরা।

আইএফডি'র যারা নিয়মিত পাঠক তারা জানেন যে আমরা এই বিষয়ে এর আগেও আলোকপাত করেছি[১]।

ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা

ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় ভুক্তভোগী হলেই। যারা ভুক্তভোগী নন, তাদেরকে সাধারণত এর প্রয়োজনীয়তা বোঝানোটা বেশ কঠিন।

ধরা যাক, আপনি একজন সাধারণ ছাত্র। আপনার বাবা নেই। মা আছেন। আপনি একটি কলেজে পড়াশুনা করছেন।

[১] এই সম্পর্কটি আলোচনাটি আমরা করেছি "আইএফডি'র দুই বছর ৩৩ দিন" শিরোনামের স্পেশাল আর্টিকেল ৪ এ যা প্রকাশিত হয় ২০১১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। এই আর্টিকেলটি পাওয়া যাবে আইএফডি'র ওয়েবসাইটে (www.ideasfd.org)।

একদিন আপনি রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছেন। সামনে দেখলেন একটি মিছিল। কোন এক দাবিতে কিছু দলের লোকজন মিছিল করছে।

হঠাৎ কি হল, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল লাগল, সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল। আপনি দেখলেন পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোড়া শুরু করেছে।

অন্যদেরকে দেখে আপনিও পালাতে লাগলেন। কিন্তু আপনার ভাগ্য খারাপ। কিছু পুলিশ আপনাকে জাপটে ধরে ফেলল। তারা আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে উঠালো একটি ট্রাকে।

আপনি বার বার বোঝানোর চেষ্টা করলেন আপনি এই মিছিলের কিছুই জানেন না। কিন্তু পুলিশ সদস্যদের কেউই আপনার কথা বিশ্বাস করতে রাজি নয়।

এরপর আপনার যায়গা হল হাজতে।

হাজত শুধু নামেই হাজত। এটা আসলে একটা দোজখ। আপনি দেখলেন ছোট্ট হাজতে গাদাগাদি করে প্রায় শতাধিক মানুষকে বন্দী রাখা হয়েছে। সবার জন্য রয়েছে একটি মাত্র বাথরুম। সেটাকে আবার বাথরুম বলাটাও কঠিন।

পরদিন আপনাকে চালান করে দেয়া হল আদালতে।

এই প্রথম আপনাকে সুযোগ দেয়া হল কিছু বলার জন্য।

আপনার সামনে একজন তরুণ বিচারক।

তিনি আপনার কথা শুনলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। কি যেন কাগজে লিখলেন।

পরে আপনি জানতে পারলেন, আপনাকে নাকি আগামী এক মাস জেলে থাকতে হবে।

এখন প্রশ্ন হল, আপনার মনের অবস্থা তখন কেমন হবে? আপনি কি কাউকে বোঝাতে পারবেন আপনার মনের কষ্ট?

আপনার পরিবারে মা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি ছোট চাকরি করেন। আপনার এমন কোন টাকা পয়সা নেই যা দিয়ে একজন ভাল আইনজীবী নিয়োগ করা যায়। তাই আপনি জামিনও পেলেন না। ফলে আপনার গন্তব্য হল জেল। কোন দোষ না করেই।

এই ধরনের কোন ঘটনা আপনার জীবনে না ঘটুক, এমনটিই আমরা চাই। কিন্তু এই ধরনের ঘটনার প্রতিনিয়ত শিকার হচ্ছেন হাজারো মানুষ। এদের অনেকেই আছেন যাদের কোন দোষ নেই। যারা শুধু পরিস্থিতির শিকার।

এই ধরনের ঘটনায় যারা ভুক্তভোগী, তাদের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগ। কারণ একমাত্র শুধু আদালতেই এই ধরনের ভুক্তভোগী মানুষের কিছুটা হলেও বক্তব্য দেয়ার সুযোগ থাকে।

তাই আমাদের বিচারকরা যদি সর্বদা ন্যায়বিচার করেন, তারা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ মন দিয়ে শোনেন, তাদের বিরুদ্ধে করা পুলিশের অভিযোগ নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, তাহলে এই সকল ভুক্তভোগী মানুষদের সঠিক বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বাড়ে।

বিচারকরা যদি ন্যায়বিচারক হন এবং বিচার বিভাগের উপর যদি সাধারন মানুষের আস্থা দিন দিন বাড়ে, তাহলে মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা শিখবে। তখন মানুষ বুঝবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে সুফল পাওয়া যায়।

ফলে কমে আসবে সমাজে শোষণ, বঞ্চনা, এবং ক্ষমতাধরদের দাপট। কেউ আর কারো টাকা মেরে উধাও হয়ে যেতে পারবে না। কারো জমি কেউ জোর করে দখল করতে পারবে না। মানুষ খুন করে কেউ পার পাবে না। কেউ মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে টাকা বানাতে পারবে না।

ফলে পুরো সমাজ ব্যবস্থার উপর যেমন সকলের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার ঝুঁকিও অনেক কমে আসবে। তারা বিনিয়োগে ঝাপিয়ে পড়বেন। তাদের বিনিয়োগ দেখে আকৃষ্ট হবেন বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও।

ফলে বাড়বে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। বাড়বে চাকরির সুযোগ। দেশ ধাবিত হবে উন্নতির দিকে। মানুষের জীবন যাত্রার মানও বাড়বে খুব দ্রুত গতিতে।

ন্যায়বিচারের উপলব্ধি

সমাজে যে ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসনের প্রয়োজন রয়েছে, তা সবার আগে উপলব্ধি করতে হবে সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের। তারা যদি না বোঝেন সমাজে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা, তাহলে সমাজে ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেক কঠিন হয়ে যায়।

সমাজের কর্তাব্যক্তিরা যদি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত থাকেন, তারা যদি অন্যায়ের প্রশ্রয়কারী হয়ে থাকেন, তাহলে তারা সব সময় মন থেকে চাইবেন, দেশের আদালতগুলো যেন দুর্বল থাকে। কারণ দেশের আদালতগুলিতে যদি ন্যায়পরায়ণ বিচারকরা আসন গ্রহণ করেন, তাহলে যে কোনদিন যে কোন বিচারক ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সমন জারি করে ফেলতে পারেন। ফলে বিপদে পড়ে যেতে পারেন সমাজের ক্ষমতাধররা।

এই কারণে ক্ষমতাধররা মন থেকে চান বিচারকরা যেন তাদের আজ্ঞাবহ ব্যক্তি থাকেন। না হলে বিপদ। মুলত এই কারণেই বাংলাদেশে বিচারক নিয়োগ নিয়ে অতীতে অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

গণতন্ত্র, জনমত এবং ন্যায়বিচার

প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনমতের উপরই নির্ভর করে সরকারের অনেক সিদ্ধান্ত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই ক্ষমতার উৎস। তাই জনগণ যা চাইছে, তাই সঠিক। এই জনমতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার একটি প্রধান Assumption হল যারা এই ধরনের জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করছেন, তারা সঠিকভাবে জনমতকে চালিত করছেন। তারা সঠিকভাবে চিন্তা করছেন।

কিন্তু বাস্তবে তা সবসময় নাও হতে পারে। অনেক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যেখানে ন্যায়বিচার এবং জনমত পরস্পরবিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু যখন সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন, তখন জনমত ছিল এই হত্যাকান্ডের পক্ষে। এই ভুল জনমতের উপর ভর করেই সেসময় এই বিচার প্রক্রিয়াকে থামিয়ে রাখা হয়েছিল যা পরবর্তিতে চালু করতে সময় লেগেছিল প্রায় ত্রিশ বছর।

কিন্তু এই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হত না যদি জনমতকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেত। এই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যাদের হাতে ছিল, তারা তখন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে ছিলেন। তারা এর কোন প্রতিবাদ করেননি। কারণ তারা তখন বন্দুকের নলকে ভয় পেয়েছিলেন।

সম্প্রতি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। সেখানে সংখ্যালঘু মুসলিমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু মিয়ানমারের ভিতর থেকে এর কোন প্রতিবাদ করা হচ্ছে না। বরং বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে এই ধরনের সংখ্যালঘুদের মেরে ফেলা উচিত।

আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে অনেকে এই সংখ্যালঘু মিয়ানমারের নাগরিকদের আশ্রয় দেয়ার আহবান জানিয়েছি[২]। অনেকে এই সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন সরকার যেন উন্নত দেশগুলোকে অনুরোধ করে এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য।

অথচ মিয়ানমারের সরকার এবং সাধারণ নাগরিকদের এই বিষয়ে কোন প্রকার সমর্থন নেই। এর কারণ তারা কেউই বুঝতে পারছেন না এই সংখ্যালঘু নাগরিকদের অধিকারের বিষয়টি। মিয়ানমারে সারা দেশের জনমত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

তাই এই ভুল জনমতের উপর নির্ভর করে মিয়ানমারের সরকার যদি সে দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, তাহলে তা সুস্পষ্টভাবেই ন্যায়বিচারের লঙ্ঘন হবে।

এই ধরনের ঘটনা উন্নত বিশ্বেও অতীতে ঘটেছে।

[২] এই সম্পর্কে আমরা একটি বিবৃতি প্রচার করি ২০১২ সালের ১৫ জুন যা পাওয়া যাবে আইএফডি ওয়েবসাইটে।

আজকাল অনেকেই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সাথে চট করেই ইউরোপ-আমেরিকার তুলনা করেন।

অথচ এই তুলনা করতে গিয়ে তারা ভুলে যান এই দেশগুলিকে বিগত শতাব্দী জুড়ে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে।

তারা ভুলে যান আজ থেকে মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে ইউরোপ-আমেরিকাতে আজকের মত গণতন্ত্র চালু ছিল না।

আজ থেকে মাত্র আশি বছর আগে ইউরোপের জার্মানি-ইতালি প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অথচ যিনি এই যুদ্ধ চালু করেছিলেন, সেই এডলফ হিটলার (Adolf Hitler) কিন্তু একজন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিই ছিলেন।

ঠিক তেমনি ইউএসএ'তে আফ্রিকান-আমেরিকানদের আজ থেকে মাত্র ষাট বছর আগেও কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। অথচ তখন আমেরিকাতে ঠিকই নির্বাচন হত, সিনেটররা নাগরিকদের ভোটেই নির্বাচিত হতেন। কিন্তু তারা কেউই আফ্রিকান-আমেরিকানদের অধিকারের বিষয়টি চিন্তা করেননি।

সেসময় যদি মি. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের (Martin Luther King Jr) জন্ম না হত, এবং তিনি যদি আফ্রিকান-আমেরিকানদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার না হতেন, তাহলে হয়ত আফ্রিকান-আমেরিকানদেরকে এই অধিকার আদায় করতে আরো অনেক সময় লাগত। আশ্চর্যের বিষয় হল মি. মার্টিন লুথার কিং কিন্তু কোন নির্বাচিত সিনেটর ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলধারার রাজনীতির বাইরের একজন ব্যক্তি।

গণতন্ত্র কোন চার চাকার গাড়ি নয় যে রাস্তায় নামালেই তা চট করে চলা শুরু করবে। এর সঠিক চালনার জন্য প্রয়োজন (১) মানুষের প্রতি ভালবাসা, (২) নৈতিকতা এবং (৩) ন্যায়বিচার। এই তিনটি উপাদানের সমষ্টি যদি কোন দেশে উপস্থিত না থাকে, তাহলে সেই দেশে গণতন্ত্র বার বার হোঁচট খায়।

বাংলাদেশে আমরা বিগত প্রায় বিশ বছর ধরে চেষ্টা করছি এই গাড়িটিকে চালানোর। কিন্তু ঠিকভাবে পারছি না। এর কারণ আমরা মনে করেছি গণতন্ত্র শুধুই একটি সিস্টেম। এই সিস্টেমকে ডাউনলোড করলেই তা ইনস্টল হয়ে যাবে। অথচ আমরা এর মৌলিক উপাদানগুলোর দিকে নজর দিয়েছি খুবই কম। ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন হল এর অন্যতম একটি নিয়ামক যার উপর নির্ভর করে গণতন্ত্র দুর্বল থাকবে, নাকি শক্তিশালী হবে।

ন্যায়বিচারের পরীক্ষা

পৃথিবীতে অনেক দেশ রয়েছে যেখানে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার পরিস্থিতি অনেক উন্নত। তবে একটি দেশে সত্যিকারের ন্যায়বিচার আছে কিনা– তা বোঝা যায় শুধু তখনই যখন সমাজে অতি ক্ষমতাহীন কিংবা চরমভাবে অপ্রিয় বা ঘৃণিত ব্যক্তিবর্গরাও বিচার বিভাগের উপর আস্থা রাখেন।

বিচার বিভাগের উপর যখন এই ধরনের ব্যক্তিবর্গের মামলা ফয়সালা করার দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন বিচার বিভাগ পড়ে যায় এক ধরনের অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে। কারণ একদিকে বিরূপ জনমত, অপরদিকে ন্যায়বিচার করার তাগিদ – দুইয়ে মিলে সৃষ্টি হয় এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিচারকদের উচিত অপ্রিয় বা ঘৃণিত ব্যক্তির বক্তব্য মন দিয়ে শুনে, তাদেরকে সকল প্রকার আইনি সুযোগ সুবিধা দিয়ে এমন একটি রায় দেয়া যাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। তাদের বিরুদ্ধে যদি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে, এবং তা যদি দিনের আলোর মত আদালতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে রায় স্বভাবতই অভিযুক্ত ঘৃণিত ব্যক্তির বিপক্ষে যাবে।

আর যদি সাক্ষ্য প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ থাকে, তাহলে বিচারক অভিযুক্ত ঘৃণিত ব্যক্তির পক্ষে এমন একটি রায় দিয়ে দিতে পারেন, যার কারণে অসন্তুষ্ট হতে পারেন বাকি সকলেই।

কিন্তু এই ধরনের অপ্রিয় সংবেদনশীল রায়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এতে মানুষের মনে বিচার বিভাগ সম্পর্কে এমন এক ধারনার সৃষ্টি হয় যাতে সকলেরই মনে হবে এই ঘৃণিত

ব্যক্তিটিও যদি আদালতে তার পক্ষে রায় পেতে পারেন, তাহলে অন্যদের বিপদের দিনেও আদালত অনুকূল রায় দিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

একটি দেশের আইনের শাসনের উপর জনগণ এবং বিশ্ববাসীর আস্থা অনেকটাই নির্ভর করে এই ধরনের অপ্রিয় সংবেদনশীল রায়ের উপর।

এই সম্পর্কিত একটি ক্ল্যাসিক উদাহরণ হতে পারে আমেরিকাতে ও.জে. সিম্পসনের (O.J. Simpson) মামলাটি[৩]।

মি. সিম্পসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তিনি নাকি তার সাবেক স্ত্রী এবং স্ত্রীর বন্ধুকে হত্যা করেছিলেন। আমেরিকার আদালতে এই হত্যা মামলাটির স্থায়িত্ব ছিল প্রায় এক বছর (নভেম্বর ১৯৯৪ – অক্টোবর ১৯৯৫)। এক বছর দীর্ঘ শুনানি শেষে এই মামলার রায়ে মি. সিম্পসন অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়কালে মিডিয়ার কল্যাণে এই মামলাটি এতোটাই জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিল যে, রায়ের দিন –

১. সারা বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি মানুষ এই রায় শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল;
২. রায়ে জনমতের প্রতিফলন না হলে রায়ট হতে পারে[৪], এই আশঙ্কায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ব্রিফ করা হয়েছিল;
৩. রায় প্রদান করার সময় দুরবর্তী টেলিফোন কলের সংখ্যা কমে গিয়েছিল প্রায় ৫৮%;
৪. নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজারে লেনদেনের পরিমাণ কমে গিয়েছিল ৪১%;
৫. কংগ্রেসম্যানরা তাদের পূর্বনির্ধারিত প্রেস কনফারেন্স বাতিল করেছিলেন;
৬. বিভিন্ন স্থানে কাজ বন্ধ থাকায় টাকার অংকে ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৪৮ কোটি ডলার;
৭. রায়ের পর টাইম ম্যাগাজিন মি. সিম্পসনের যে ছবিটি কভারে ছাপিয়েছিল, তাতে তারা ইচ্ছা করেই ছবিটিকে অন্ধকার করে দিয়েছিল যাতে তার সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। পরে এই বিষয়টি ধরা পড়ে যাওয়াতে টাইম ম্যাগাজিনকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।

[৩] এই মামলার আনুষ্ঠানিক নাম People of the State of California v. Orenthal James Simpson
[৪] মি. সিম্পসন ছিলেন একজন আফ্রিকান আমেরিকান এবং তার নিহত স্ত্রী নিকোল ব্রাউন ছিলেন হোয়াইট মহিলা।

এখানে উল্লেখ্য, মি. সিম্পসন অবশ্য পরবর্তিতে ২০০৮ সালে একটি ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত হন, এবং সেই মামলার রায়ে তার ৩৩ বছর কারাদন্ড হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ এই ধরনেরই একটি পরিস্থিতি বা অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে।

মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত একাধিক ব্যক্তি বর্তমানে জেলে বন্দী অবস্থায় আছেন। আদালতে তাদের বিচার চলছে। এখন পর্যন্ত দুটি রায় হয়েছে। বাকি রায় এখনো হয়নি।

কিন্তু এর মধ্যে জনমত চলে গেছে বন্দী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। তাদের প্রতি ঘৃণা এতোটাই ছড়িয়েছে যে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির ফাঁসির রায় ছাড়া আর কোন রায়ই মানতে রাজি নন। এই ব্যাপারে তারা কোন যুক্তিও মানতে রাজি নন।

এই ধারা চলছিল অনেক আগ থেকেই। মিডিয়ার প্রচারণা, রাজনীতিবিদদের প্রতিনিয়ত আস্ফালন, ইত্যাদি মিলে দেশে এখন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে বিচারকদের জন্য এই বিষয়ে নির্মোহ এবং নিরপেক্ষভাবে রায় দেয়া অনেক কঠিন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৃত্যুদন্ডের বিধান

শাহবাগে যে সকল তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা আন্দোলন করছেন, তারা সকলেই দাবি জানিয়েছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে যেন অবশ্যই ফাঁসি দেয়া হয়। এই ধরনের দাবি এর আগেও বিভিন্ন মহল থেকে করা হয়েছে। তবে এখনকার মত আবেগের এতটা বিস্ফোরণ অতীতে কখনো ঘটেনি।

এখানে উল্লেখ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মৃত্যুদন্ডের বিধানের বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক দেশে ইতোমধ্যেই মৃত্যুদন্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে সকল দেশে মৃত্যুদন্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে নরওয়ে অন্যতম।

অতি সম্প্রতি এন্ডার্স বেহরিং ব্রেভিক (Anders Behring Breivik) নামে এক নরওয়ের নাগরিক সাতাওর (৭৭) জনকে বোমা এবং গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরবর্তীতে আদালতে তার বিচার হয়। কিন্তু নরওয়েতে মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধ থাকাতে এতো হত্যার পরও তার কোন মৃত্যুদন্ড হয়নি। তার জেল হয়েছে ২১ বছরের।

মৃত্যুদন্ডের বিধানের বিরুদ্ধে জনমতের একটি প্রধান কারণ হল, মনে করা হয় বিচারক যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের রায় দেন, তাহলে তার মনের অজান্তেই এমন কোন ভুল হয়ে যেতে পারে যাতে একজন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়ে যেতে পারেন। আর এই মৃত্যুদন্ড যদি কার্যকর হয়ে যায়, তাহলে এই ভুল শুধরানোর আর কোন উপায় থাকবে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধরনের অনেক মৃত্যুদন্ডের ঘটনা ঘটেছে যেখানে পরবর্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে বিচারকের রায় ভুল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই ভুল শোধরানোর এখন আর কোন উপায় নেই।

পাঠকরা এই ধরনের ভুল মৃত্যুদন্ডের রায় সম্পর্কে জানার জন্য ইন্টারনেটে সার্চ দিতে পারেন[৫]।

আমরা আইএফডি'র পক্ষ থেকে মৃত্যুদন্ড সংক্রান্ত আমাদের অবস্থান অতীতে ব্যাখ্যা করেছি। মৃত্যুদন্ড সম্পর্কে আমরা আমাদের অবস্থান প্রথম তুলে ধরি আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে **"বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড, মৃত্যুদন্ডের বিধান এবং কিছু কথা"** শিরোনামের স্পেশাল আর্টিকেলের মাধ্যমে।

সেই সময়ে আদালতে বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের রায় দেয়া হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতিও হত্যাকারীদের ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এমন এক পরিস্থিতিতে আমরা আর্টিকেলটি লিখেছিলাম বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ক্ষমা করার আবেদন জানিয়ে। আর্টিকেলটি লেখার সময় আমরা মানসিকভাবে বেশ অস্বস্তিতে

[৫] এই সম্পর্কিত একটি সুন্দর মুভি হল Clint Eastwood অভিনীত True Crime। পাঠকদের উচিত এই মুভিটি দেখা।

ছিলাম। কারণ বিষয়টির সাথে দেশের সর্বাধিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত আবেগ জড়িত। আর আমরা জানি আবেগ কোন যুক্তি মানতে চায় না।

কিন্তু তারপরও কেন জানি এমন একটি আবেদন করার তাগিদ মনে কাজ করছিল।

আমরা মৃত্যুদন্ডকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার পক্ষে নই। তবে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার যদি রাজি থাকে, তাহলে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে দন্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়ার পক্ষে আমাদের অবস্থান। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি দেশের রাষ্ট্রপতিরও এই ক্ষমা করার এখতিয়ার থাকা উচিত। তবে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার যদি ক্ষতিপূরণ নিতে রাজি না থাকে, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদন্ড ছাড়া অন্য কোন শাস্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা নিকট ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত লেখার আশা রাখি।

মৃত্যুদন্ডের রায়

একজন বিচারক যদি ন্যায়বিচারক হন, তাহলে তার পক্ষে মৃত্যুদন্ডের রায় দেয়া কিন্তু সহজ কাজ নয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সত্যিকারের হত্যাকারী হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি তার অপরাধ নিজ থেকে স্বীকার না করেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায়, তিনি সর্বোতভাবে চেষ্টা করবেন বিচারকের রায় যেন তার পক্ষে থাকে। ফলে তিনি এমন আইনজীবী নিয়োগ দেবেন যারা যুক্তিতর্কে পারদর্শী।

মানুষ মানুষকে সাধারণত হত্যা করে সবার অলক্ষ্যে। হত্যাকান্ডটি যদি সর্বসমক্ষে সংঘটিত না হয়, তাহলে নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এই অভিযোগটি আদালতে প্রমাণ করা। মৃত্যুদন্ডের রায় শুধু তখনই দেয়া হয় যখন উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিত এবং সন্দেহাতীতভাবে (beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যিই হত্যাকান্ডের সাথে সরাসরি যুক্ত[৬]।

তাই অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনজীবীরা সবসময়ই সচেষ্ট থাকেন বিচারকের মনে এমন সন্দেহের সৃষ্টি করা যাতে বিচারকের মনে হতে পারে যে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ব্যক্তিটি আসল হত্যাকারী নন।

[৬] এই বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য পাঠকরা Henry Fonda অভিনীত 12 Angry Men শীর্ষক মুভিটি দেখতে পারেন।

এই ধরনের প্রচেষ্টা যখন চলতে থাকে, তখন একজন বিচারক চাইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেকসুর খালাশ দিয়ে দিতে পারেন, অথবা তিনি মৃত্যুদন্ডের বদলে অন্য কোন লঘু দন্ড দিতে পারেন। ফলে একজন প্রকৃত হত্যাকারী মানুষ হত্যা করার পরও মৃত্যুদন্ডের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন।

কোন একটি হত্যাকান্ডকে আদালতে সহজে প্রমাণ করা যায়না বলেই বাংলাদেশের অনেক শীর্ষ সন্ত্রাসীকে এখনো ফাঁসি দেয়া যায়নি যদিও তাদের বিরুদ্ধে অনেক হত্যাকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা যাবজ্জীবন জেল খাটছেন। এর কারণ, তাদের বিরুদ্ধে যে সকল হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে, তার কোনটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যায়নি।

আবার এমন অনেক সন্ত্রাসী রয়েছে যারা সহজেই জামিনে বের হয়ে আসতে পেরেছেন কারণ তারা এতোটাই দুর্ধর্ষ যে তাদের অপরাধের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার মত সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশে যেহেতু ন্যায়বিচার পরিস্থিতি ভাল নয়, সেহেতু সাক্ষীরা ভয় পান তারা যদি আদালতে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন, তাহলে এমন এক দিন আসবে যখন এই সন্ত্রাসীরা জেল থেকে বের হয়ে তাদেরকেই গুলি করে মারবে।

ফলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য র‍্যাবের ক্রসফায়ারের উদ্ভব হয়েছে যার মাধ্যমে অতীতে অনেক শীর্ষ সন্ত্রাসীকে কোন প্রকার বিচার প্রক্রিয়া ছাড়াই গুলি করে মারা হয়েছে। এই ধরনের বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে এতোটাই ক্ষমতা চলে আসে যে তারা যে কোন সময় এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে ফেলতে পারেন। ফলে তাদের ক্রসফায়ারের বলি হতে পারেন নির্দোষ ব্যক্তিরাও।

শেষ কথা

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ন্যায়বিচার কিংবা আইনের শাসনের পক্ষে কথা বললে যে কোন ব্যক্তি ধরে নেবেন যে এর মাধ্যমে আসলে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষেই কথা বলা হচ্ছে। অথচ দেশের গুটিকয়েক যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসনের পক্ষে কথা বলছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, তারা আসলে কেউই জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে যুক্ত নন।

আমরাও যে এই পরিস্থিতিতে ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসনের পক্ষে কথা বলছি, তাতেও কিন্তু অনেকের মনে হতে পারে যে আমরা আসলে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক। কিন্তু আমরা আপনাদেরকে বলছি, আমরা কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক মডেলের সমর্থক নই। তারা যেভাবে ইসলাম ধর্মকে ব্যাখ্যা করেন, আমরা ইসলাম ধর্মকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিনা।

কিন্তু তার পরও আমরা ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসনের পক্ষে কথা বলছি যদিও আমাদের কথাগুলো জামায়াতে ইসলামীর পক্ষেই যাচ্ছে। কারণ আমরা জানি আজকে যদি জামায়াতে ইসলামীর বন্দী সদস্যরা আদালতে ন্যায়বিচার পান, তাহলে বাংলাদেশ এক ধাক্কাতেই অনেক দুর এগিয়ে যাবে যা আগে আমরা কখনোই চিন্তা করিনি।

অনেকেই আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন, দেশে যখন এতো এতো অন্যায় হচ্ছে, খুন খারাপি হচ্ছে, অথচ সেই সব বিষয়ে চুপ থেকে শুধুমাএ রাজনৈতিক মামলার বেলাতেই আমরা কেন ন্যায়বিচারের কথা বলছি।

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এই আর্টিকেলের শুরুতেই। আমরা বলেছি, সমাজের কর্তাব্যক্তিরা যদি ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তাহলে দেশে আইনের

শাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হয়ে যায়। আমাদের আজকের প্রচেষ্টাও সেই উদ্দেশ্যকেই কেন্দ্র করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শাহবাগে অবস্থানরত তরুণ প্রজন্মের সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করে আমরা অল্প কিছু কথা বলব।

আপনারা জোরালো কণ্ঠে অভিযুক্তদের শুধুমাএ ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন। আর কোন রায় আপনারা মানেন না।

আপনারা যদি এই দাবিতে অটল থাকেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যান, তাহলে হয়ত দেখা যাবে সত্যি সত্যি একদিন সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির ফাঁসির রায় হয়ে গেছে। ফলে জয়ী হবেন আপনারা। আপনারা তখন উল্লাশে ফেটে পড়বেন।

কিন্তু তখন সর্বত্র প্রশ্ন উঠবে, বিরূপ জনমতের কারণেই আসলে বিচারকরা বাধ্য হয়ে সকলকে ফাঁসি দিয়েছেন। তাই এর দায়ভার তখন আপনাদের উপরেই বর্তাবে। কারণ আপনারা তখন শুধু ফাঁসির দাবিতেই অটল ছিলেন।

আবার উল্টোটাও হতে পারে।

বিচারকরা যদি জনমতে প্রভাবিত না হন, এবং বাস্তবে যদি দেখা যায় আদালতের রায়ে কারোরই ফাঁসি হয়নি, তখন আপনাদের কি হবে? আপনারা কি তখন হতাশ হয়ে যাবেন? এতো কষ্ট এবং সংগ্রামের পরও আপনারা যদি আপনাদের প্রত্যাশিত রায় না পান, তাহলে দেশের সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার উপরে কি আপনাদের অনাস্থা সৃষ্টি হবে?

আমরা জানি না আমাদের এই প্রশ্নগুলির উওরে আপনারা কি বলবেন।

আপনাদের উওরের অপেক্ষা না করেই আমরা এই পরিস্থিতিতে আপনাদেরকে দুটি পরামর্শ দিচ্ছি। আমরা জানি না আমাদের পরামর্শ আপনাদের কানে পৌঁছাবে কিনা। আর

পৌঁছালেও তা আপনারা শুনবেন কিনা। কিন্তু তারপরও এই দুটি পরামর্শ আপনাদেরকে দিচ্ছি।

প্রথমত, আপনারা শুধুমাত্র ফাঁসির দাবি না করে এর বদলে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচারের দাবি তুলুন। চোখ বন্ধ করে মনে মনে ঠিক করুন, আপনারা দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক তা চান, এবং আদালতের যে রায়ই হোক না কেন, তা আপনারা মেনে নেবেন।

আপনাদের স্লোগানে এই সামান্য অথচ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনটি আনতে পারলে ভবিষ্যতে তা ভাল ফল বয়ে আনবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের দ্বিতীয় পরামর্শটি আপনাদের আন্দোলনের ব্যাপ্তি নিয়ে।

আপনারা ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন আপনাদের মঞ্চে কোন রাজনীতিবিদকে আপনারা বক্তব্য দিতে দিবেন না। আপনারা দাবি করেছেন, এই আন্দোলনটি হবে দল নিরপেক্ষ।

তবে আমরা বলব ভিন্ন কথা।

আমরা বলব, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল নিরপেক্ষ বলে কোন শব্দ নেই। আমরা প্রত্যেক নাগরিকই আসলে কোন না কোন দলের সমর্থক। আমরা যারা রাজনৈতিক দলের বাইরে আছি, তারা রাজনীতি না করলেও অন্তত ভোটের সময় সাময়িকভাবে কোন না কোন দলের পক্ষে কাজ করি। তাই রাজনীতিকে জীবন থেকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়।

আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, রাজনীতিবিদরাই দেশের উন্নয়নে নের্তৃত্ব দিচ্ছেন। তারাই আমাদের নেতা। নেতারা যদি ভুল করেন, তাহলে আমরা তাদের ভুল ধরিয়ে দেব। আর ভুল ধরিয়ে দেয়ার পরও তারা যদি একই ভুল বার বার করতে থাকেন, তাহলে আমরা নতুন নেতার খোঁজ করব, এবং তা করব নির্বাচনকালীন ভোটের মাধ্যমে।

তাই আপনাদের কাছে আমাদের পরামর্শ, আপনারা সকল দল এবং মতের রাজনীতিবিদরকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান। তাদেরকে বক্তব্য দিতে দিন। আপনাদের আন্দোলনে তাদেরকেও সঙ্গী করুন।

এই আন্দোলনকে দল নিরপেক্ষ রাখার একমাএ উপায় হচ্ছে সকল দলের এবং মতের রাজনীতিবিদদেরকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা। এর কোন বিকল্প নেই।

১৯৭১ সালে একটি অন্যায় এবং শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছি।

সেই সময় স্বাধীনতার পক্ষের ব্যক্তিদের অবস্থান ছিল – অন্যায় এবং শোষণমুক্ত দেশ গড়তে হলে আমাদেরকে স্বাধীন হতে হবে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে হবে।

সেই সময় যারা স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিলেন, তাদের অবস্থান ছিল – পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে একটি অন্যায় এবং শোষণমুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব নয়।

কিন্তু আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে বসে সেই স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিদেরকেই যদি কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাএ আবেগের বশে অন্যায়ভাবে গণহারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেই, তাহলে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা বিরোধীদেরই অবস্থান সঠিক ছিল?

আপনারা কি একটি বারও এই বিষয়টি ভেবে দেখেছেন?

তাই আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা –

আপনাদের আন্দোলন হোক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার।
আপনাদের আন্দোলন হোক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার।
আপনাদের আন্দোলন হোক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার।
আপনাদের আন্দোলন হোক সর্বদলের, সর্বমতের।

তথ্যসূত্রঃ www.wikipedia.org

লেখকের নিজের কথা

জন্মস্থান বাংলাদেশের সিলেট জেলা। বর্তমানে সৌদি আরবে একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন যথাক্রমে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। পাশ করার সাথে সাথেই ঢাকা'র সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগে (সিপিডি) ইন্টার্ন হিসাবে গবেষণা জীবনের শুরু।

পরবর্তীতে আবারো মাস্টার্স করতে পাড়ি জমান ইউএসএ'তে। এবারের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড – কলেজ পার্ক। সেখান থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০০২ সালে।

ফিরে আসেন আবার বাংলাদেশে ২০০৩ এর শেষের দিকে। পুনরায় যোগ দেন গবেষণা কাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় থেকে পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলেও লেখক হিসাবে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক ***'যায়যায়দিন'*** পত্রিকার মাধ্যমে। ২০০৪–২০০৬ সময়কালে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং নীতিহীনতা নিয়ে তার একাধিক রচনা সাপ্তাহিক যায়যায়দিনে প্রকাশিত হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে তার একাধিক গবেষণা প্রবন্ধও রয়েছে।

মি. মাবরুর মাহমুদ বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি টিভি দেখেন, গবেষণা করেন, ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন, এবং পরিবারের সাথে সময় কাটান।

আইএফডি পরিচিতি

IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মূল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. মাবরুর মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মূলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পন্নোত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাএ। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মূল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বএই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ দেখিয়ে দেবে। এক্ষেএে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপূর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাএ অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মুল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাএ পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেএে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাএ একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মুল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাএ আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

[Keyword for Websearch:IFD Special Article 6, Rule of Law, Justice, War Crimes, Bangladesh Independence]